বর্ষ ২৪: ৫ সংখ্যা মে ২০১৫

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

শ্রম অধিকার সম্পর্কে জানব
অধিকার রক্ষায় এগিয়ে আসব

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (ডাম)

সম্পাদকীয়

মে সংখ্যা এখন আপনাদের হাতে। এক বীরত্বের কথা মনে করিয়ে শুরু হয় মাসটা। মাসের ১ তারিখ আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস। শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের দিন।

শ্রমজীবী মানুষেরা শ্রম দিয়ে গড়ে কল-কারখানা, দালান কোঠা। ঘরে ঘরে কাজ করে তারা সচল রাখে জীবন। কিন্তু তাদের ঘরে খাবার থাকে না। তারা ন্যায্য মজুরি পায় না। এই 'আলাপ'-এ আপনাদের জন্য এ নিয়ে দু'টি লেখা রয়েছে। 'আড়ালেই থাকছে গৃহভিত্তিক কর্মীর অবদান' এবং 'আরজুর মে দিবস'। প্রথম লেখাটিতে গৃহভিত্তিক কর্মীদের প্রসঙ্গে বিভিন্ন তথ্যমূলক বর্ণনা রয়েছে। পাশাপাশি গৃহভিত্তিক কর্মীদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কী কী সেবামূলক কর্মসূচি চালু আছে তা জানা যাবে। আর অন্য লেখাটি গল্পের ঢংয়ে বলা হয়েছে শ্রমিকের জীবন-কথা। এ গল্পের আরজু এখানে শুধু একজন ব্যক্তি নন। একজন শ্রমিক। সেই শ্রমিকদের জীবনের বেশ কিছু ঘটনার কথা আপনি জানতে পারবেন এ লেখায়।

এ মাসেই মা দিবস। ১০ মে দিবসটি পালন করা হবে সারা দুনিয়ায়। মায়ের জন্য আমাদের রয়েছে অন্তর ভরা ভালোবাসা। কারণ মা হলেন আমাদের সেরা বন্ধু, সেরা আপনজন। একমাত্র মা-ই নিজের জীবন দিয়ে সন্তানকে রক্ষা করেন। এজন্য মিশন পরিচালনা করছে মা সাক্ষরতা অভিযান। এছাড়া এবারের 'আলাপ'-এ রয়েছে সান্দাদের প্রতি ভালোবাসা শিরোনামে লেখা। মাকে নিয়ে দু'টি ছড়া ও একটি চিঠি এ সংখ্যার আকর্ষণ বাড়িয়েছে। এছাড়া নিয়মিত বিভাগগুলো রয়েছে যথারীতি।

আলাপ

বর্ষ ২৪: ৫ সংখ্যা
মে ২০১৫

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম এহছানুর রহমান

সম্পাদনা পর্ষদ
মোহাম্মদ মহসীন
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

অলঙ্করণ
রফিকুল ইসলাম ফিরোজ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স
সেকান্দার আলী খান

ছবি: ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ও ইন্টারনেট।

- আড়ালেই থাকছে গৃহভিত্তিক কর্মীর অবদান ১-৩
- গল্প: আরজুর মে দিবস ৪-৫
- শিশুশ্রম বিষয়ক লুডু ৬-৭
- খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ৮
- কথামালা: মা-বাবা ৯
- পাঠকের পাতা ১০-১১
- মা সাক্ষরতা অভিযান: মেয়ের কাছে হিসেব শিখল ১২
- তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব ১৩
- ছবির ধাঁধা ১৪

মূল্য: ২০ টাকা

আড়ালেই থাকছে গৃহভিত্তিক কর্মীর অবদান

রায়ের বাজার। ঢাকা শহরের একটি এলাকা। এই এলাকার একটি বস্তিতে থাকে আলেয়া। ভাই ভাবীর সাথে থাকে সে। আলেয়ার ভাই দর্জির কাজ করে। ভাবী একটা গার্মেন্টস এ চাকরি করে। আসলে ভাইয়ের সংসার সামলায় আলেয়া। সংসার বলতে তাদের একটা মাত্রই ঘর। বুড়ো বাবা মা আর ভাইয়ের দুই বাচ্চাসহ পরিবারে সাতজন সদস্য। ঐ একটা ঘরেই গাগাগাদি করে থাকে তারা। ভাইয়ের দোকানের কাজেও সহায়তা করে আলেয়া। তার হাত খুবই ভালো। তাই হাতের সেলাইয়ের কাজগুলো তাকেই করতে হয়। সেলাইয়ের হাত ভালো বলেই একজন আপা নামমাত্র টাকায় তাকে দিয়ে কাপড়ে নকশা করে নেয়। আলেয়ার ভাবী মর্জিনাও রাতের বেলায় সেই আপার কাজ করে। আপা নাকি শহরের কোনো বড় দোকানে এসব কাপড় দেয়। আলেয়ারা সেই দোকানের নাম ঠিকানা জানে না। জেনেই বা কি লাভ? জানতে গেলে যদি তাদের কাজটাই ছুটে যায়।

গৃহভিত্তিক কর্মী কারা

আলেয়া, মর্জিনার মতো বাংলাদেশে আরো অনেক নারী বা পুরুষ কর্মী আছে। যারা গৃহে বা ঘরে বসে নীরবে হাতের কাজ করে। এদের কেউ পিঠা তৈরি করে। কেউবা কাগজের ঠোঙা বানায়। তারা এরকম বিভিন্ন দরকারি জিনিস তৈরি করে। এরা শিল্পী, এরা কারিগর। এরাই হলেন গৃহভিত্তিক কর্মী। বাংলাদেশে তিন কোটির বেশি গৃহভিত্তিক কর্মী রয়েছে। এসব গৃহভিত্তিক কর্মীর সংখ্যা গ্রাম থেকে শহর এলাকায় বেশি। তারা তাদের তৈরি সুন্দর সুন্দর সব পণ্য দিয়ে আমাদের চাহিদা মেটায়। কিন্তু তাদের নিজেদের চাহিদা কতটুকু পূরণ হয়? এই খবর আমাদের অনেকেরই অজানা।

গৃহভিত্তিক কর্মীদের অবস্থা

আমাদের দেশে গৃহভিত্তিক কর্মীরা নানাভাবে বঞ্চিত হয়। বস্তির নোংরা অমানবিক পরিবেশে তাদের বসবাস। একই ঘরে অনেকে গাদাগাদি করে থাকে। সেই ঘরে আলো বাতাস নেই বললেই চলে। এরা মজুরি ও অধিকার আদায়ের ব্যাপারে উদাসীন। এদের মজুরি এত কম যে চিন্তাই করা যায় না। যা আয় হয় তা দিয়ে সংসার কীভাবে চলে তারাই জানেন। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটায় তারা। আর এজন্যই গৃহভিত্তিক কর্মীদের অনেকেই স্বাস্থ্যহীন, পুষ্টিহীন। প্রায় সারা বছরই তারা নানা রোগে ভোগে। তারা এটাও জানে না তাদের কাজের সঠিক মূল্য বা মজুরি কত হতে পারে। আর এই সুযোগকেই কাজে

লাগাচ্ছে কিছু সুবিধাবাদী মানুষ। তাদের দিয়ে নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে নিচ্ছে তারা। বিনা পরিশ্রমেই নিজেরা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করেও বঞ্চিত ঐ মানুষদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। তাছাড়া গৃহভিত্তিক কর্মীদের অনেকেই আছেন, যাদের রয়েছে অনেক প্রতিভা। তাদের প্রতিভা থাকার পরও সুযোগের অভাবে তারা সেটা প্রকাশ করতে পারছে না। তাদের উৎপাদিত পণ্যের কিছু অংশ বাজারজাত হলেও বাকিটা হেলায় ফেলায় নষ্ট হয়।

এ অবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন

গৃহভিত্তিক কর্মীদের এ অবস্থার পরিবর্তন দরকার। এজন্য প্রথমেই দরকার তাদের কাজের স্বীকৃতি। শ্রমিক হিসেবে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। তারা নীরবে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাদের এই অবদানের কথা সবার সামনে তুলে ধরতে হবে। যা অনেকের কাছেই অজানা। তাদের এই কাজের স্বীকৃতি দিতে হবে। দিতে হবে তাদের দক্ষতার ন্যায্য মূল্য। এছাড়া গৃহভিত্তিক কর্মীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন ও সুরক্ষা নীতিমালা তৈরি করতে হবে। যেখানে উল্লেখ থাকবে তাদের ন্যায্য মজুরির কথা। থাকবে উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাত করার নিয়ম। প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রাপ্তি, সামাজিক নিরাপত্তার বিষয়গুলোরও সঠিক সমাধান থাকবে তাতে। তবে শুধু আইন বা নীতিমালা প্রণয়ন করলেই হবে না। তার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজন সরকারি বেসরাকরি উদ্যোগ

এজন্য সরকারের পক্ষ থেকে জোরালো চেষ্টা থাকতে হবে। সরকার রাষ্ট্রীয়ভাবে গৃহভিত্তিক কর্মীদের কাজের স্বীকৃতি দিতে পারে। আইন ও নীতিমালা তৈরি করে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করতে পারে। গৃহভিত্তিক কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে হবে। এজন্য জাতীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা যেতে পারে। সম্মানজনক ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করে দিতে পারে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রয়কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে। বিক্রয়কেন্দ্র এবং গৃহভিত্তিক কর্মীর মধ্যে যোগাযোগের সুযোগ তৈরি করতে পারে। অনলাইনের মাধ্যমে পণ্য বিক্রির জন্য সুযোগ তৈরি করা যেতে পারে। এতে গৃহভিত্তিক কর্মীদের তৈরি পণ্যের সরাসরি বাজারজাত করা যাবে। তাদের উৎপাদিত পণ্যে দিয়ে আয়োজন হতে পারে মেলা। এর পাশাপাশি এসব পণ্য বিদেশে রপ্তানির উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। সরকারি বা বেসরকারিভাবে গৃহভিত্তিক কর্মীদের উৎসাহ যোগাতে বিভিন্ন পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেইসাথে মিডিয়া বা সকল গণমাধ্যমের সহায়তায় তাদের অধিকার সচেতন করার উদ্যোগ নিতে পারে। সরকারি বেসরকারি ব্যাংকগুলো সহজ শর্তে ঋণ দেবার

ব্যবস্থা করে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারে।

গৃহভিত্তিক কর্মীদের জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের ভূমিকা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের মতো মিশনে রয়েছে নানা ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি। আছে নগরদোলার মতো একটি বিক্রয়কেন্দ্র। যেখানে গৃহভিত্তিক কর্মীরা সরাসরি তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন। এজন্য প্রথমে তাদের তৈরি পণ্যের নমুনা দেখাতে হয়। পরবর্তীতে আলোচনা সাপেক্ষে অর্ডার নিতে হয়। আরো আছে ভিটিআইয়ের মতো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। যার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মীরা বাড়াতে পারে নিজেদের দক্ষতা। মিশনের প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে এ বিষয়ক নানা উপকরণ। আরো আছে মিশনের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি। যেখান থেকে সহজ শর্তে ঋণ নিয়ে উদ্যোক্তা হয়ে গৃহভিত্তিক কর্মীদের দক্ষতা প্রমাণের সুযোগ রয়েছে। আছে আলোকিত বাংলাদেশ ও আলাপ পত্রিকার মতো গণ মাধ্যম। যার সাহায্যে কর্মীদের অধিকার সচেতন করছে মিশন। তথ্য প্রদানের পাশাপাশি কর্মীদের সাফল্যের কাহিনী প্রকাশ করে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করছে। এভাবে মিশন গৃহভিত্তিক কর্মীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে নানাভাবে।

গৃহভিত্তিক কর্মীদেরও হতে হবে সচেতন

ন্যায্য মজুরি বা অধিকার প্রতিষ্ঠা যাই বলি না কেন। এজন্য গৃহভিত্তিক কর্মীদের সচেতন হতে হবে। অধিকার বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সহায়ক বা সহায়তাকারী হিসেবে কাজ করতে পারে। এজন্য প্রথমে তাদের অধিকারগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। কর্মী থেকে উদ্যোক্তা হবার স্বপ্ন দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন থাকলে তা একদিন পূরণ হবেই হবে।

লুৎফুন নাহার তিথি
প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ।

আরজুর মে দিবস

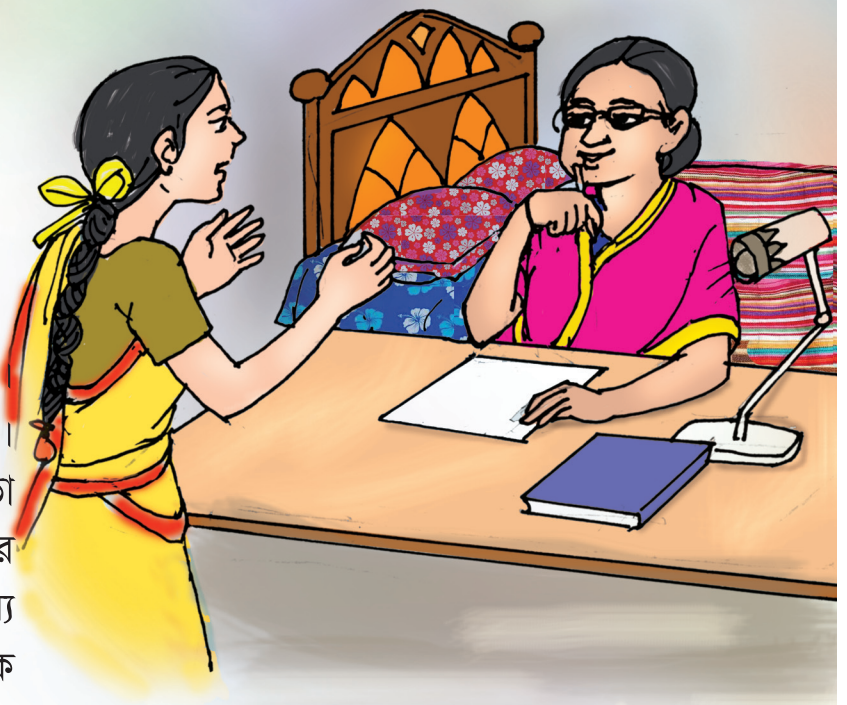

পাঁচ বছর হয়েছে আরজু ঢাকায় এসেছে। ঢাকায় এসে গার্মেন্টসে কাজ নিয়েছিল সে। গার্মেন্টসে আগুন লাগা, বিল্ডিং ধ্বসে পড়া ইত্যাদি দূর্ঘটনা লেগেই থাকে। এসব দেখার পর গার্মেন্টসে কাজ করতে ভয় লাগে। এজন্য এক বাসায় বাধা কাজ নিয়েছে। মাসিক বেতন ২০০০ টাকা। বাড়ির মালিক আয়শা আপা খুব ভালো মানুষ। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। বেতন ছাড়াও আপা তাকে খাওয়া, চিকিৎসা এবং বছরে দুই ঈদে পোশাক দেন। সব কিছু মিলিয়ে আরজু ভালোই আছে। তবে তার ঐ একটাই কষ্ট। তাহলো কোনো ছুটি নেই তার। ছুটি দেয়া হয় ঈদের পর। এজন্য বছরে মাত্র ২ বার বাড়ি যায়।

আপার কাছে আরজু শুনেছে পহেলা মে শ্রমিকদের জন্য একটি বিশেষ দিন। তাই পৃথিবীর সব দেশেই নাকি এই দিনটি শ্রমিক দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এই দিন সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। শ্রমিকদের মজুরি, ছুটিছাটা নিয়ে দাবি জানানো হয়। গত বছর আরজু আপাকে জানিয়ে ছিল পহেলা মে কোনো কাজ করব না। আপা কথাটি শুনে একটু হেসেছিল। তারপর বলেছিল, আমার শ্বশুরবাড়ি থেকে মেহমান আসবে। আমি একা একা কি করে সব সামলাব? আপার জন্য মায়া হয়েছিল আরজুর। এজন্য গত বছর আর ছুটিতে থাকা হয় নি তার।

আপার কাছে শুনেছে আবার এসেছে সেই মে দিবস। আরজু ভাবছে এবার সে ছুটিতে থাকবে। কিন্তু আপা খুব ব্যস্ত। বাসায় থাকলে সারাক্ষণ কী যেন লেখালেখি করেন। ছুটির কথা কীভাবে বলবে ভেবে পায় না। তাই ফাই ফরমাস করার ফাঁকে ফাঁকে আরজু মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। এক সময় চুপ করে পাশে গিয়ে বসে।

আরজু: আপা এত রাত জেগে কী করেন?

আপা: মে দিবস আসছে। শ্রমিকদের নিয়ে প্রেস ক্লাবে যেতে হবে। তাদের দাবির কথা বলতে হবে।

আরজু ভাবে, বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে তারা কী শ্রমিক নয়? তবে কেন তারা দাবি জানায় না? তারা কেন এই দিন বন্ধ পায় না?

আরজু: কী দাবির কথা বলবেন আপা। ছুটি ও ন্যায্য মজুরির কথা? অফিসে যারা কাজ করে দাবি কি শুধু তাদের জন্য আপা? বাসাবাড়িতে যারা কাজ করে তাদের কথা বলবেন না।

আপা: হ্যাঁ সবার কথাই বলব। অর্থের জন্য যারা অন্যের হয়ে কাজ করে তারা সবাই শ্রমিক। সবার জন্যই ছুটি, ন্যায্য মজুরি পাওয়ার অধিকার আছে।

আরজু: তাহলে আপা আমাদের সমস্যাগুলো আগে জানতে হবে আপনাকে। অনেক বাড়ির মালিক বাধা কাজের মানুষকে ঠিকমতো খেতে দেয় না। ন্যায্য মজুরি দেয় না। কেউ কেউ মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। ঘরের ছোটখাটো ক্ষতি হলে তাদেরই দোষ দেয়। বেতন থেকে কেটে রাখে।

বাসাবাড়িতে যারা ছুটা কাজ করে, বিভিন্ন অযুহাতে তারা প্রায়ই ছুটি কাটাতে পারে। পারি না শুধু আমরা বাধা কাজের মানুষেরা। ইচ্ছে করলেও যখন তখন ছুটি নিয়ে বাড়ি যেতে পারি না। বাড়ির মালিকরাও আমাদের কোথাও বেড়াতে নিয়ে যায় না। আবার একাও ছাড়ে না।

আরজুর কথাগুলো নিয়ে ভাবলেন আয়শা খানম। আরজুর কথা তার মনে ধরে। তিনি বললেন, বাসাবাড়িতে যারা বাধা কাজ করে এবার তাদের কথাই বলব। তাদের ছুটি, কর্মবিরতি ও ন্যায্য মজুরির কথা হবে এবার। তোকেও এবার প্রেসক্লাবে নিয়ে যাব। তুই নিজের মুখে তোর দাবির কথা জানাবি। কথা বলার আগে নিজে মানতে হয়। তাই এবার মে দিবসে আমার দিক থেকে তোর ছুটি। অন্য দাবি দাওয়া নিয়ে দুজনে এক সময় বসব। সব দাবি একবারে পূরণ করা হয়ত সম্ভব হবে না। আলোচনা করে ঠিক করে নেব আমরা। আপার কথাগুলো শুনে খুশিতে আরজু মন ভরে গেল। সে মনে মনে ভাবল, সবাই যদি আপার মতো হতো। তাহলে শ্রমিক মালিক মিলে সবাই আনন্দে দিন কাটাতে পারত।

ঝুঁকির কাজ ছাড়ব

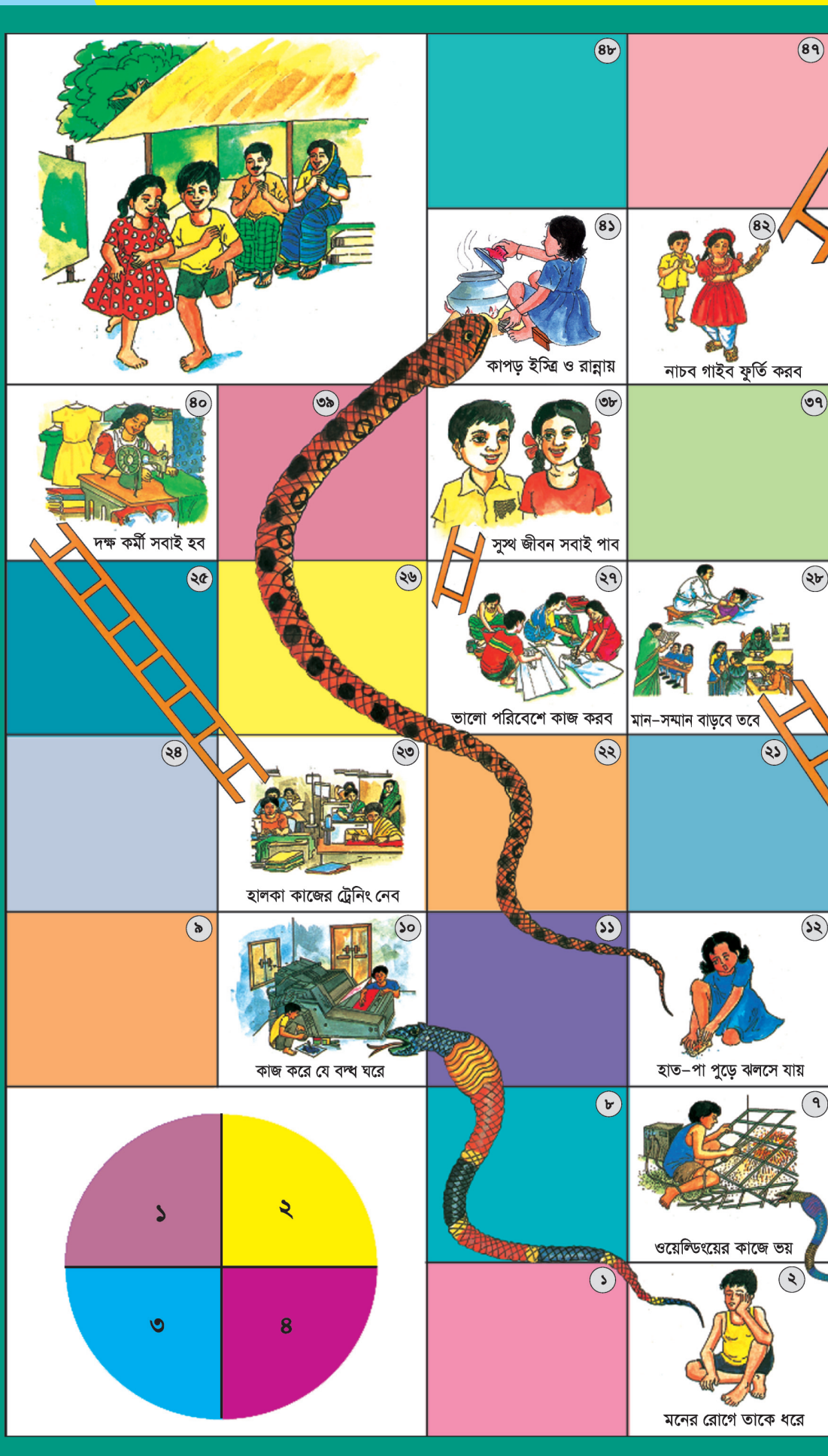
৪৮
৪৭
৪১
কাপড় ইস্ত্রি ও রান্নায়
৪২
নাচব গাইব ফুর্তি করব
৪০
দক্ষ কর্মী সবাই হব
৩৯
৩৮
সুস্থ জীবন সবাই পাব
৩৭
২৫
২৬
২৭
ভালো পরিবেশে কাজ করব
২৮
মান-সম্মান বাড়বে তবে
২৪
২৩
হালকা কাজের ট্রেনিং নেব
২২
২১
৯
১০
কাজ করে যে বন্ধ ঘরে
১১
১২
হাত-পা পুড়ে ঝলসে যায়
৮
৭
ওয়েল্ডিংয়ের কাজে ভয়
১
২
মনের রোগে তাকে ধরে
১
২
৩
৪

সুস্থ জীবন গড়ব

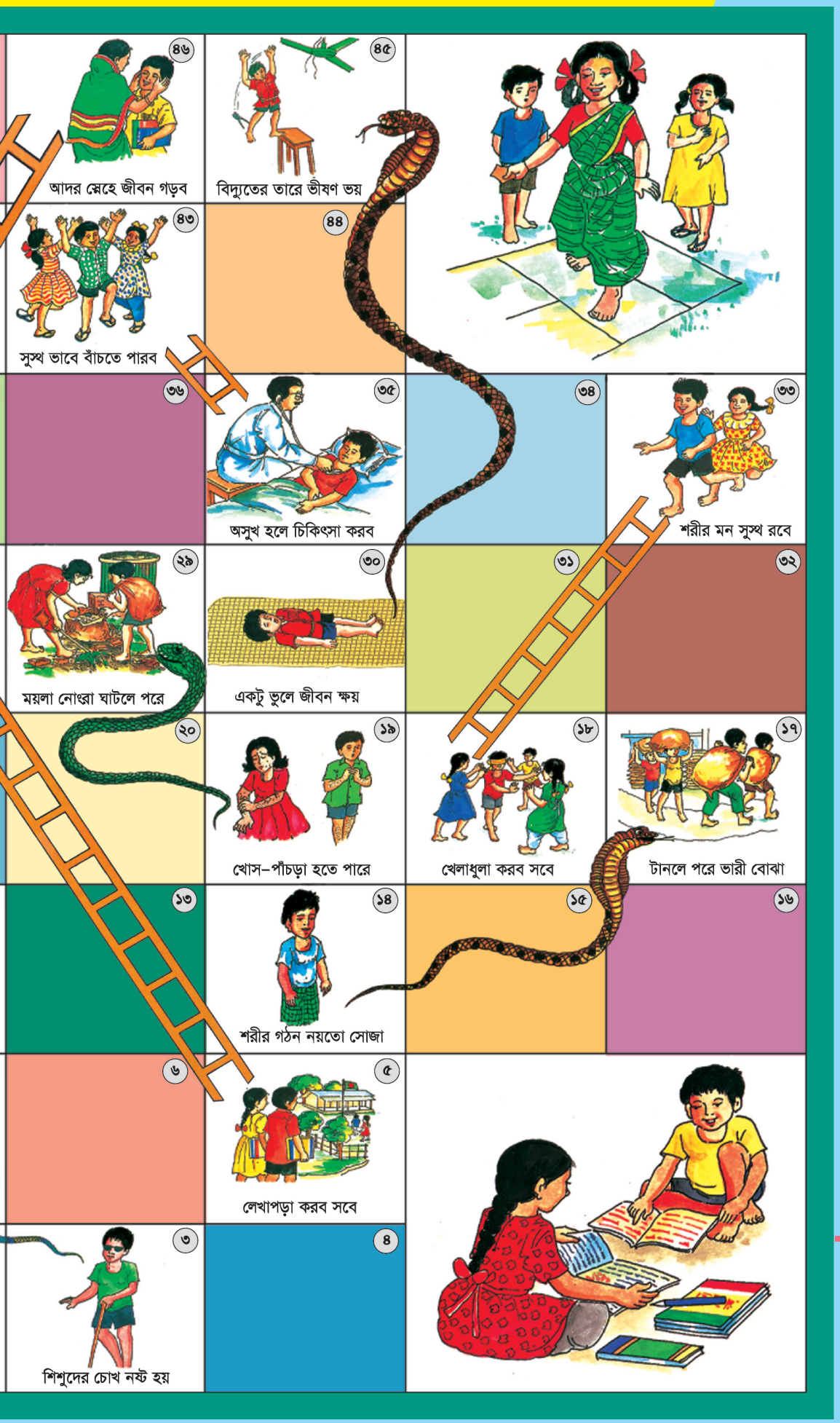

সূত্র : ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের শিশু শ্রম বিষয়ক লুডু : ঝুঁকির কাজ ছাড়ব সুস্থ জীবন গড়ব থেকে সংগৃহীত

Avjvc-07

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন দর্শন

সান্দারদের প্রতি ভালোবাসা

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই বংশ ভেদাভেদ দেখা যায়। এই ভেদাভেদ তৈরি করেছে মানুষ নিজেরাই। ধর্মে কোনো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। এক সময় মুসলমানদের মধ্যে এই ভেদাভেদ খুব বেশি ছিল। সেসময় এ রকম একটি ঘটনা ঘটেছিল টাঙ্গাইল জেলায়। সেখানে বাস করত সান্দার নামে এক মুসলমান সম্প্রদায়।

এই সম্প্রদায়ের লোকদের খুবই ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কারণ ছিল জীবিকার প্রয়োজনে তারা কখনো নৌকায় বসবাস করত। তাদের মেয়েরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র ফেরি করত। এই অপরাধে সমাজের সবাই সান্দারদের ঘৃণা করত। কেউ তাদের সাথে মিশত না। কেউ তাদের কাছে জমি বিক্রি করত না। একই ঘরে তারা গাদাগাদি করে বাস করত। খেয়ে না খেয়ে দিন কাটত। এই করুণ অবস্থা দেখে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) মনে ব্যথা পান। এ প্রসঙ্গে তিনি 'মাসিক সাম্যবাদী' পত্রিকায় লিখেছেন, "স্থানীয় মুসলমানরা হাড়ি, ডোম, তোলী, সাহা বা অন্য হিন্দুর নিকট জমি বিক্রয় করিবে; তবু তাহাদের ধর্মের ভাই সান্দারদের নিকট বেশি দামেও জমি বিক্রয় করিবে না। অথচ পবিত্র কোরআনে স্বয়ং আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন "নিশ্চয়ই মুসলমানরা ভাই ভাই।" আরেক জায়গায় তিনি লিখেছেন- "জিনিসপত্রের ব্যবসা দ্বারা সান্দাররা জীবিকা অর্জন করে। ইহা নিতান্ত হালাল রুজি।" আসলে খানবাহাদুর

আহ্ছানউল্লা (রঃ) ছিলেন মানব দরদী। তাঁর আদর্শ ছিল- পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর। অন্যায় করলে তাকে বুঝিয়ে বলো। তাকে সুযোগ দাও। তাহলে সে তার ভুল শোধরাবে। নইলে অভাবের জন্য আরো বিপথে যাবে।

এজন্য তিনি একই প্রবন্ধে লিখেছেন- "আরও ভাবিবার বিষয়, পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইতেছে। মুসলমানদের অনুদারতার জন্য এই সান্দারগণ যদি, খোদা না করুন হিন্দু হইয়া যায়, তবে মুসলমানগণ সেজন্য দায়ী হইবেন।" এভাবে তিনি সমাজের ভেদাভেদ ভুলে সবাইকে একসাথে এগিয়ে যাবার উৎসাহ যুগিয়েছেন। আসুন, আমরা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলি। একে অপরের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াই।

মা-বাবা

নামাজ পড়ে রোজা রাখে মা-বাপকে দেয় কষ্ট,
এবাদত তার হয় না কবুল- বাণী এটাই পষ্ট।
মা-বাপ যদি সন্তানের প্রতি রুষ্ট হয়ে মরে,
বরাদ্দ হয় জাহান্নাম যে সেই বান্দার তরে।
-আল-কোরআন।

একটি আশা মাতা-পিতার পূর্ণ করলে তবে,
সন্তানের সত্তর আশা পূর্ণ যে গো হবে।
হতে পারে সে আশা তার দুনিয়া-আখেরাতে,
জান্নাত দেবেন আল্লাহ তারে সন্দেহ নেই তাতে।
-আল-কোরআন।

সেই ব্যক্তি ধ্বংস হউক অভিশাপের সাজে,
মা-বাবাকে বৃদ্ধ পেয়েও জান্নাত পেল না যে।
মায়ের পায়ের নিচে বেহেশ্‌ত শোনো সন্তানেরা,
আল্লাহ এবং নবীর পরে মা-বাবাই যে সেরা।
-আল-হাদিস।

সন্তানের প্রতি মা-বাপ যদি থাকেন খুশি হয়ে,
পরকালে আল্লাহ তারে জান্নাত যাবেন লয়ে।
ভালোবাসার চোখে যদি তাকায় তাঁদের দিকে,
ওমরাহ হজের সওয়াব তারে আল্লাহ রাখেন লিখে।
-আল-হাদিস।

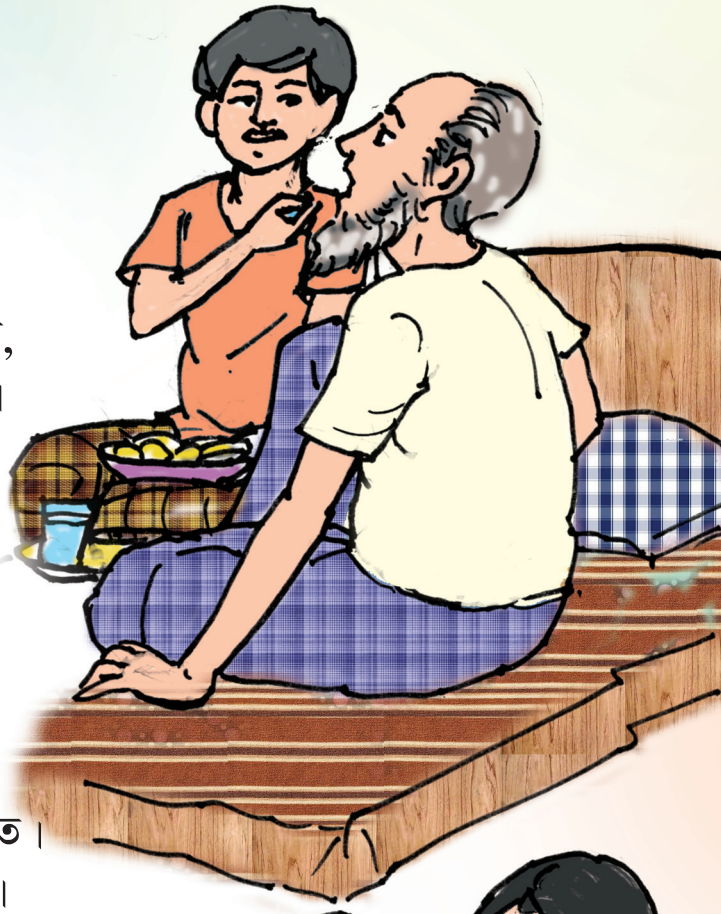

মাগো

মাগো তোমার কথা ভাবলে আমার
চোখে আসে জল,
তোমায় ছেড়ে থাকতে মাগো
পাই না মনে বল।

তুই যে আমার নয়ন মণি,
লক্ষ চাঁদের আলো।
ভুল ত্রুটি সব করিস ক্ষমা,
একটু বাসিস ভালো

তোর মুখের ঐ মধুর ডাকে
সব কিছু যাই ভুলে।
সারা জীবন রাখিস মাগো,
তোর আঁচলের তলে।

থাকি মাগো ঢাকার শহরে
চাকরি করি তাই,
মৃত্যুর পরে চরণ তলে
দিস মোরে ঠাই।

ইয়াসমিন রশনি
আলোর ভূবন সিএলসি ।

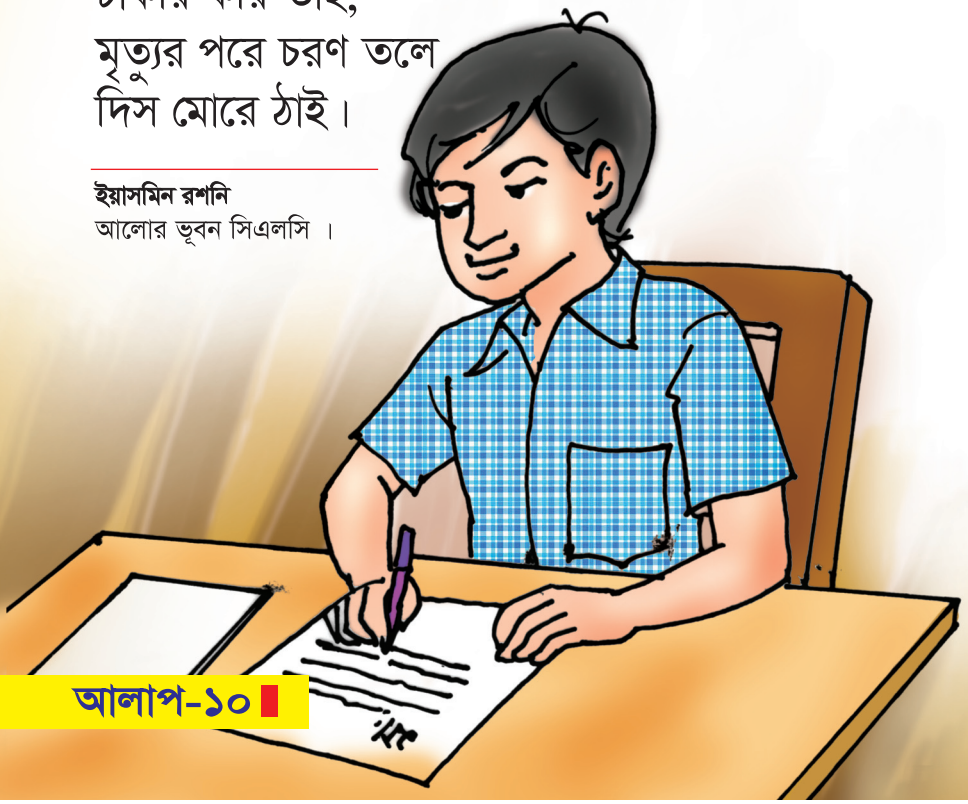

মায়ের আদর

মায়ের আদর ছেড়ে আমি
কেমন করে থাকি?
ইচ্ছা হলেই মনে মনে
মায়ের ছবি আঁকি।

মায়ের ছবি আঁকি যতই
তৃষ্ণা ততোই বাড়ে,
যত দূরে থাকি না কেন
দেখতে আসি তারে।

চোখ দুইটি দেয়নি ফাঁকি
আমার সোনার মাকে,
সোনার মাকে হারালে আমি
দুঃখ বলব কাকে?

কমলা আক্তার
আলোর পথে সিএলসি।

মায়ের কাছে চিঠি

মা,

“মা কেমন আছো? ভালো আছো তো? আমাকে কি ভুলে গেছো মা? তোমার প্রিয় মেয়ের কথা কি তোমার একটুও মনে পড়ে না। তোমার চাঁদের টুকরো, তোমার সোনামণিকে এভাবে ভুলে গেলে? কই কোনো দিন তো আমায় বলো নি। তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাবে, দূরে অজানায়। সেই যে গেলে আর তো আমাকে দেখতে এলে না।

জানো মা, তুমি চলে যাওয়ার পর কেউ আমাকে আগের মতো খুকি বলে ডাকে না, আদর করে না। মমতার চাঁদর জড়িয়ে আমায় কতো মজার মজার গল্প শোনাতে। কেউ ভালো করে কথাই বলে না, গল্প শোনাবে কে? সবাই কেমন যেন পাষাণ হয়ে গেছে মা। মনে হয় কারো বুকে একটুও ভালোবাসা নেই। আগেও কি সবাই এমন ছিল? কখনও বুঝি নি তো! মনে হচ্ছে তুমি চলে যাবার সাথে সাথে মমতার চাদর যেন কেউ উঠিয়ে নিয়ে গেছে। মা, মাগো, আমার মলিন চেহারায় কারো দরদ মাখা হাতের ছোঁয়া এখন পড়ে না। জোর করে ধরে কেউ চুল আঁচড়িয়ে দেয় না মা। নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়। জীবন যে এতটা কষ্টের হয় কখনো ভাবতে পারি নি। কাউকে আমার দুঃখগুলো শোনাতে খুব ইচ্ছে হয়। কিন্তু কাউকে পাই না। কেন তুমি মরে গেলে মা। ফিরে এসো মা। আমি তোমার অপেক্ষায় দিন গুণছি।

ইতি
তোমার সোনামনি

সাদিকা আফরিন
শিশু শিখন কেন্দ্র, লুদ্দাখালী আবুল কালাম মাস্টার বাড়ি।

মায়ের পড়ালেখা

মা সাক্ষরতা অভিযান

মেয়ের কাছে হিসেব শিখেছে রহিমা

আমি মোছা: রহিমা বেগম। আমার বয়স ৩৭ বছর। আমার স্বামীর নাম সুরুজ মিয়া। আমাদের গ্রামের নাম শিমুলতাইর। এটি সরিষাবাড়ী, জামালপুর জেলায় অবস্থিত। আমার বাবার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এজন্য ১ম শ্রেণির পড়া শেষ না হতেই হয় আমার পড়ালেখা বন্ধ হয়ে যায়। ১২ বছর বয়সে বিবাহ হওয়ায় স্বামীর সংসারে এসে শুরু হয় আরেক কষ্টের জীবন। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের জীবন। তাদের কষ্টের সীমা থাকে না।

অভাবের কারণে রাস্তায় মাটি কাটার কাজ নেই আমি। আমার স্বামীও দিন মজুরি হিসেবে কাজ করে। এতে যা আয় হয়, তা দিয়ে চলে সংসার। আমাদের গ্রামে রয়েছে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের 'পরশমনি শিশু শিখন কেন্দ্র'। সেখানে অনেক ছেলে মেয়েরা পড়ালেখা করে। আমি আমার মেয়ে মোছা: ঝুমি আক্তারকে সেখানে ভর্তি করে দিই। সে এখন স্বাধীন পর্যায়ে পড়ে। বাড়ির পাশে হওয়ায় মেয়েটির স্কুলে যেতে কোনো সমস্যা হয় না। একদিন ঐ স্কুলের আপার সাথে আমার কথা হলো। তিনি জানতে চাইলেন আমি প্রাইমারি স্কুলের পড়া শেষ করেছি কিনা? জবাবে বললাম, পড়ালেখা জানি না। এজন্য হিসাব নিকাশ করতে আমার খুবই সমস্যা হয়। এর কিছুদিন পর আপা আমাকে একটি বই দেন। বইটি হাতে নিয়ে করুণ চোখে তাকাই। তাই দেখে আপা বললেন, ভয় নেই। আমরা আপনার মেয়েকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। সে আপনাকে পড়াবে। ঝুমি তখন আমার সাথে ছিল। সে বলল, মা আমি তোমাকে সহযোগিতা করব। তখন আমার বুকটা গর্বে ভরে উঠল। তারপর থেকে মেয়ের কাছে আমি পড়া শুরু করি। আমি এখন হিসেব নিকাশ করতে পারি। আমি কেমন পড়তে পারি তা দেখার জন্য মিশন অফিস থেকেও দেখতে আসে। আমি এখন আমার মেয়ের বইও কিছু কিছু পড়তে পারি। আমি বুঝেছি, বই পড়লে অনেক কিছু জানা যায়।

মোঃ আসাদ উল্লাহ
এরিয়া ম্যানেজার, সরিষাবাড়ী, জামালপুর

তথ্য প্রযুক্তির গুরুত্ব

তথ্য প্রযুক্তি এখন যুগের চাহিদা। তথ্য প্রযুক্তিতে যে জাতি যত বেশি উন্নত, তারা বিশ্বে তত বেশি উন্নত হিসেবে পরিচিত। তথ্য প্রযুক্তি এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি বিশ্বের উন্নত ও পিছিয়ে থাকা দেশগুলোকে এক কাতারে দাঁড় করাতে পারে। এজন্যই বাংলাদেশের মতো পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তথ্য প্রযুক্তির কারণে বদলে যাচ্ছে কাজের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের জীবন মান। আমাদেরও বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। তার আগে জানতে হবে, তথ্য প্রযুক্তি ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে।

তথ্য প্রযুক্তি কী

তথ্য হলো ডাটা বা উপাত্ত। যেমন- বই, নকশা, মানচিত্র, চুক্তি, আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, দলিল, নমুনা, পত্র, ইত্যাদি। এছাড়া অডিও, ভিডিও, ছবি বা চিত্র, ফিল্ম তথ্যের মধ্যে পড়ে। যা আমাদের প্রযুক্তির উপকরণ। আর প্রযুক্তি হলো বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার। বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারগুলোর সঠিক ব্যবহার করাও প্রযুক্তির অংশ। তাই তথ্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ করার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়াকে এক কথায় 'তথ্য প্রযুক্তি' বলা হয়। বর্তমানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন হলো তথ্য প্রযুক্তির অন্যতম মাধ্যম। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বলা যায়, এরা একে অন্যের পরিপূরক। প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের আদান-প্রদান বা যোগাযোগ করাকেই বলা হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি।

যুব সমাজ উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার

আজকের যুব সমাজ, ভবিষ্যত দেশ গড়ার কারিগর। দেশ গড়াসহ সমাজের সকল পরিবর্তনে যুবরাই দেয় নেতৃত্ব। তবে খালি হাতে কোনো পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। এজন্য দরকার একটি মোক্ষম হাতিয়ার। বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তিই হলো সেই হাতিয়ার। তথ্য প্রযুক্তির বিপুল সম্ভবনাকে কাজে লাগাতে হবে।তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সময়কে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারবে যুব সমাজ। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার চারভাগের তিনভাগই যুব সমাজ। জনসংখ্যার এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবাহার করে, তবেই না দেশের উন্নয়ন ঘটবে। দুর্নীতি, সামাজিক অবক্ষয়, ইত্যাদির বিরুদ্ধে ঐকমত গড়ে তুলতে পারে। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ঐকমত গড়ে তুলতে পারে। তাহলে ঠিকই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবে তার কাঙ্খিত উন্নয়নের দিকে।

ধাঁধা

"একটি মেয়ে... কিনতে বাজারে গেল। তারপর একটি... ছেলের সাথে ধাক্কা খেয়ে... মেয়েটি পড়ে গেল। তার হাতের ...পড়ে গেল। ছেলেটি... করে হাসল। তারপর...করে বলল, সরি। মেয়েটি বলল, আমার .....নষ্ট হলো, তার কি হবে? ছেলেটি.... সুরে বলল, মন খারাপ করো না। আমি তোমার... এনে দিচ্ছি। শুনে মেয়েটি এবার...হাসল।"

উপরের এই লেখাটিতে কিছু ফাঁকা জায়গা আছে। এই জায়গায় সঠিক শব্দ বসাতে হবে। কিন্তু একটা শর্ত আছে। তাহলো একটি মাত্র শব্দ সব জায়গায় বসিয়ে বাক্যগুলোর ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে হবে। শব্দটি কি? তাহলে ভেবে বের করুন শব্দটি। তারপর ঝটপট লিখে পাঠিয়ে দিন আলাপের ঠিকানায়।

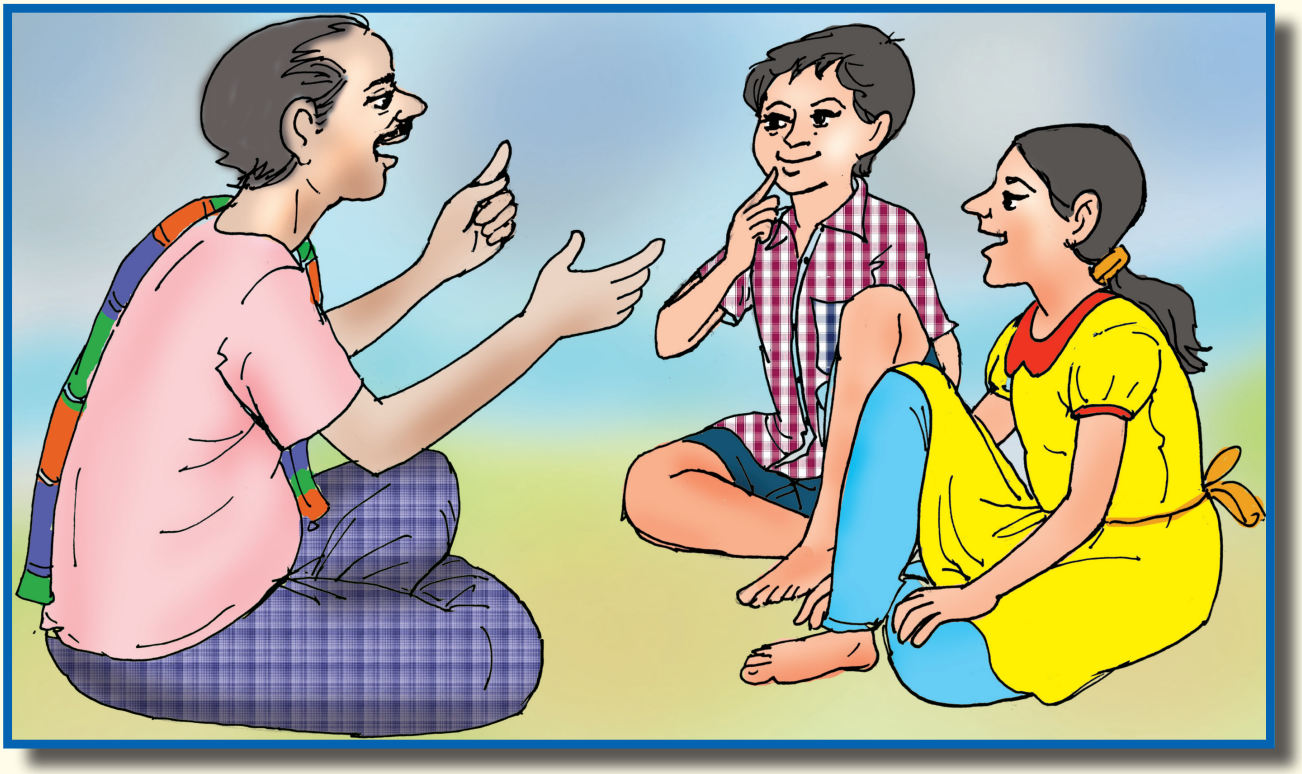

এখন থেকে আলাপ নিয়মিত ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...
www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা
ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯
The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission